মেদিনীপুরের লবণ কারবার

রাজর্ষি মহাপাত্র

মেদিনীপুরের ও ওড়িষার চরভূমিতে বহুপ্রাচীন কাল থেকে লবণের উৎপাদন হত। মুসলমান রাজত্বের পূর্বেও নিম্নবঙ্গ বিশেষতঃ হিজলী প্রদেশ, লবণ প্রস্তুতের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। শাল্‌তী করে অতি সহজে লবণ নিয়ে যাওয়ার জন্যে বদরশাচরের সন্মুখস্থ ডাঙ্গা থেকে সাঁকরাইলের কাছে সরস্বতী নদী পর্যন্ত একটি ছোট খাল কাটা হয়েছিল। এটা সাধারনত "নিমকীর খাল" নামে পরিচিত ছিল। এই পথ দিয়ে অল্পদিনেই ওড়িষায় যাওয়া যেতো। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব এই পথ দিয়েই যাত্রী করেছিলেন পুরীর উদ্দেশ্যে। আন্দুলের কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর অতিথি হয়েছিলেন।

মুসলমান রাজত্বে সুলতান সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে হিজলী নিমখ মহালের উল্লেখ দেখা যায়। বাংলার নবাবী আমলে হিজলী লবণ কারবার নবাব সরকারের কর্তৃত্বাধীনে দেশীয় জমিদারদের দ্বারাই পরিচালিত হত।
ঐ সময় এদেশ থেকে লবণ সংগ্রহের জন্য কীরী, শিখ, মুলতানী, ভাটিয়া প্রভৃতি নানাদেশীয় ব্যবসায়ী আসতো। এর ফলে এদেশের লোকেরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতো। পরবর্তীকালে কোম্পানীর কর্মচারীরা এই কারবারটিকেও একচেটিয়া করায় বিদেশী ব্যবসায়ীগণের এদেশে আগমনের পথ দ্ধ হয়ে যায়।

১৭৬০ সালে মীরকাশিম যখন মেদিনীপুর ইংরাজদের হাতে ছেড়ে দেয়, তখন কিন্তু লবণ উৎপাদনের লাভজনক "মহাল হিজলী" রেখে দেন নিজের হাতে। পাঁচ বছর পরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলার দেওয়ানী লাভ করে তখন স্বভাবতই কোম্পানীও এই লাভজনক ব্যবসা নিজের খাস দখলে নিয়ে আসে। ১৭৮১ সালে কোম্পানী এই ব্যবসা পরিচালনার জন্য নতুন দপ্তর খোলেন। কৃষকদের তিন চতুর্থাংশই চাষ এবং লবণ শিল্প উভয় কাজে নিযুক্ত। তাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছলই ছিল। মোটের ওপর ১৭৬৫ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত লবণের ব্যবসা ছিল ইংরেজদেরই একচেটিয়া।

আসলে একচেটিয়া বাণিজ্যের পদক্ষেপ দাদনের মাধ্যমে শু হয়েছিল ১৭৬৫ সালে রবাট ক্লাইভ 'সোসাইটি অব ট্রেড' এর মাধ্যমে লবণের একচেটিয়া কারবারের অধিকার গ্রহণ করে কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীদের আয় বৃদ্ধির উপায় করেছিল। এর আগে ইংরেজ কর্মচারীরা দেশীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করত। ক্লাইভ কর্মচারীদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে দেশীয় বাণিজ্যে অবৈধ ভাবে অংশ গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পদস্থ কর্মচারীদেরকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সুপারি তামাক ও লবণের একচেটিয়া কারবার থেকে লাভের অংশ পর্যায় ত্রমে বন্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুবছর পর (১৭৬৭) অবশ্য সোসাইটি অব ট্রেড উঠিয়ে দেওয়া হছিল এবং ইংরেজ কর্মচারীদের লবণের ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে আগের মত দেশীয় জমিদার ও বণিকগণ লবণ তৈরী করবার ও লবণ তদারকি ফিরে পেলেন।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন তখন তিনি কোম্পানীকে লবণের একচেটিয়া কারবারের অধিকার দান করলেন। এই ভাবে কোম্পানীর 'সোসাইটি অব ট্রেড' এর মাধ্যমে লবণের একচেটিয়া কারবার ও অ

াগের মত জমিদার ও বণিকদের স্বাধীনভাবে লবণ প্রস্তুত কিছুকাল চলবার পর ১৭৭২ সালে (৭ অক্টোবর) লবণের একচেটিয়া কারবার কোম্পানী নিজের হাতে গ্রহণ করে 'কমিটি অব রেভিনিউ' এর মাধ্যমে লবণ প্রস্তুতের জন্য পাঁচশালা বন্দোবস্ত দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। লবন তৈরী হয় এই ধরনের জমি মালগুজারী অর্থাৎ রাজস্ব দেওয়া হয় সেই ধরণের জমি থেকে পৃথক করা হল। সেইজন্য জমিদারদের ক্ষতিপূরণ বা মাসোহারা দেওয়ার অথবা রাজস্ব হ্রাস করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। তারপর লবণ তৈরী হয় সেই ধরনের জমি বণিকদের আগাম চুক্তি করে বছরে কত লবণ তারা উৎপ াদন করবে তা স্থির করা হয়। এই আগাম চুক্তিতে লবণের মূল্যের তিন—চতুর্থাংশ কোম্পানীকে প্রথমেই দিতে হত এবং ম াত্র এক চতুর্থাংশ লবণ যখন সরবরাহ করা হবে তখন দিতে হত।

যেসব বণিক লবণ প্রস্তুত করাতো (Production merchantsগ্ন তারা লবণ প্রস্তুত করার সুযোগ আর পেল না। জমিদা রি ব্যবস্থায় যেমন নির্দিষ্ট খাজনার পরিবর্তে জমিদারগণ জমি ভোগদখল করতো সেরকম লবণ উৎপাদন ও নির্দিষ্ট পরিম াণ অর্থের বিনিময়ে এক এক অঞ্চলে লবণ প্রস্তুতের দায়িত্ব পেত। যে সব বণিক লবণ প্রস্তুতের বন্দোবস্ত গ্রহণ করত তারা গোমস্তা নিয়োগ করে লবণ প্রস্তুতের তদারকি করতো।

১৭৭৭ সালে পূর্বেকার ব্যবস্থার পরিবর্তে এক বছর রাজস্বের পরিবর্তে বাৎসরিক বন্দোবস্ত চালু করা হয়েছিল। লবণ মহ াল বা নিম্‌কি মহাল জমিদারদের বন্দোবস্ত দেওয়ার রীতিও চালু হল। এছাড় লবণ প্রস্তুত করছে যারা তাদেরকে 'দাদন' দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। কোম্পানী তাদের যেমন দাদন দিত, তারা আবার মলঙ্গি অর্থাৎ প্রকৃত যেসব ব্যক্তি লবণ তৈরি করে তাদেরকে 'দাদন' দিত। এই ব্যবস্থাও বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সুতরাং ১৭৮০ সালে এক নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী 'এজেন্সীব্যবস্থা (Agency Systemগ্ন প্রবর্তন করা হল। লবণ মহাল গুলিকে ছয়টি এজেন্সিতে ভাগ করা হল, যথা হিজলী, তমলুক, চবিবশপরগনা, রাইমঙ্গল, খুলনা ও চট্টগ্রাম। প্রত্যেক এজেন্সিতে একজন লবণ এজেন্ট বা লবণ প্রতিনিধি ছSalt Agentগ্নিয়োগ করা হল। তবে এই ব্যবস্থার ফলে জমিদার, এদেশীয় ও ইউরোপীয় বণিকগণ কেউই লবণ তৈরীর ব্যাপারে আর জড়িত থাকতে পারল না। অবশ্য এজেন্সী প্রথায় লবণের একচেটিয়া কারবারে কোম্পানীর প্রচুর লাভ হত। লড কর্নওয়ালিস শাসনভার গ্রহণ করে কিছু পরিমাণ লবণ নিলামে বিক্রি করার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। ফলে মোট আয়ের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই নিলামে লবণ বিক্রির প্রথা ১৮৩৬ সালে পরিত্যক্ত হয়।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে, এজেন্সী প্রথা শু হয় ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বরের আদেশবলে, কিন্তু মেদিনীপুরের রেভিনিউ রেকর্ডস থেকে জানা যায় ১৭৭৩ সালের শুতেই রবার্ট রীড নামে একজন কর্মচারী প্রথম লবণ এজেন্ট নিযুক্ত হন। মনে হয় সিংহ ভুল ভেবেছিলেন। নিমক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে হিজলী ও তমলুকে ''সল্ট এজেন্ট'' উপাধিকারী দুজন ইংরেজ কর্মচ ারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারা মেদিনীপুরের কালেক্টরের অধীনে কাজ করবেন স্থির হল। জমিদারের কাছে লবণ কিনে ব্যবস ায়ীদের লবণ বিক্রি করাই হল তাদের প্রধান কাজ। এই সব সল্ট এজেন্টদের লবণ ব্যবসায়ীদের লবণ ব্যবসার তত্বাবধান ছাড়াও সামান্য ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ পরিচালনাও করতে হত। ঐ সময় নিমক মহালের ক াজে হিজলী প্রদেশে বহু সংখ্যক উচচপদস্থ কর্মচারী ও গুণশালী শিক্ষিত দেশীয় কর্মচারীদের আগমন ঘটেছিল। কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের ঠাকুর স্বর্গীয় লালমোহন, সেরেস্তাদারী দেওয়ানী কেরানী প্রভৃতি বিভাগের কাজের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে গেছেন। টমাস কালভার্ট সাহেব ও আর্কডেকিন সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তমলুকের প্রথম সল্ট এজেন্ট এবং ডনির্থন সাহেব ও কর্লিক সাহেব শেষ সল্ট এজেন্ট ছিলেন। গ্রান্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণী থেকে জানা যায় যে সে সময়ে ফোর্ট উইলিয়ামের অন্তর্গত সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বাৎসরিক যত লবণ উৎপন্ন হত তার এক তৃতীয়াংশের বেশী লবণ হিজলী প্রদেশ থেকেই পাওয়া যেত।

কার্তিক মাস থেকে আরম্ভ করে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এ প্রদেশে লবণ প্রস্তুতের কাজ চলতো। সাধারণতঃ যেসব জমি বর্ষা ক ালে জোয়ারের জলে ধুয়ে যেতো সেই সব জমিতেই লবণ প্রস্তুত হত। ঐ সব জমিকেই চর বলা হত। চরগুলি আবার খাল াড়ী নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক খালাড়ীতে সাত জন করে লোক নিযুক্ত থেকে গড়ে ২৩৩ মণ লবণ প্রস্তুত করত। ঐ সব লোক 'মলঙ্গী' নামে অভিহিত হত। মলঙ্গীরা কার্তিক মাস থেকে জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত লবণ প্রস্তুতের কাজে

নিযুক্ত থাকত, তারপর বর্ষা আরম্ভ হলেই। স্ব স্ব চাকরান (শর্তে প্রাপ্ত) জমিতে কৃষিকাজ আরম্ভ করে দিত। এই ভাবে তারা বারো মাসই কাজে নিযুক্ত থেকে যথেষ্ট উপার্জন করত। নবাবী আমলে মেদিনীপুর জেলায় প্রায় চার হাজার খালাড়ী ছিল। প্রতি একশত মণ লবণ তখন প্রায় ৬০ টাকামূল্যে মহাজনদের বিক্রি করা হত, এবং খরচ বাদে যা উদ্বৃত্ত তা জমিদার ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মদারীদের লাভ ছিল।

সে সময় প্রধান লবণ ব্যবসায়ী "ফকর-উল্-তজ্জব" (ব্যবসায়ীদের গৌরব) বা " মালীক-উল-তজ্জব" (ব্যবসায়ীদের রাজা উপাধি) লাভ করতেন। অর্থাৎ এই কারবার ঐ সময়ে কিরূপ সম্মান এবং লাভজনক ছিল তা এই দুটি উপাধি থেকেই বোঝা যায়। মুসলমান শাসনের শেষ পর্যন্ত এই প্রদেশে ঐরূপ বন্দোবস্তের মাধ্যমেই কাজ চলেছিল, তা W.W. Hunter Statistical Account of Bengal (Vol III)ও গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ বঙ্গের ঐ সময়কালের নবাবকে বাধ্য করে এদেশের লবণ তামাক ও সুপারির বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রচার করতে। অবশ্য চণ্ডীচরণ সেন তার মহারাজা নন্দকুমার গ্রন্থে লিখেছেন যে, "এই নিয়মানুসারে কার্য আরম্ভ হওয়া মাত্র দেশের দূর্দশা আরম্ভ হল। দেশীয় প্রজাগণের আর কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকল না।"

এই নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার পর এই প্রদেশের লবণ নির্মাতা এবং লবণ মহালের জমিদারদের নামে নবাবের পরওয়ানা বের হল যে কলকাতার ইংরেজ বণিক - সভার কাছে মুচলেকা দিতে হবে যে, যত লবণ উৎপাদন করবে তার সবটাই ইংরেজ বণিক সভার কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকবে। তাদের কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে বিক্রি করা যাবে না। এর ব্যতিক্রম হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ঐ সময় হিজলীর অন্তর্গত জালামুঠা পরগণার জমিদার রাজা লক্ষীনারায়ণ চৌধুরীর ওপর যে পরওয়ানা জারী হয়েছিল এবং মাজনা-মুঠার জমিদার রাজা যাদবরাম রায় যে মুচলেখা দিয়েছিলেন সেগুলি নীচে দেওয়া হয় ঃ

১ম " Parwanas issued to the gomasta of Lakshminarayan Choudhury of the parganah of jallamuta". "Be it understood. That a request has been made by the governor and the gentlemen of the committcc and council to this purpose. That until the contracts for salt of the said gentlemen are settled, no salt shall be made. Or got ready in any district; that a gomasta be sent to attend on the said gentlcmen, and having given a bond, he may then proceed to his business, and make salt, but till the bond be given to the Governor and the gentlemen of the committee and council. They should make none. I herefore, this order is written, that you send without delay, your gomasta to the said gentlemen in Calcutta, and give your bond, and settle your business and then proceed to the making of salt. In case of and delay, it will not be your good."

2) "Muchleka of Jadavram Roy, Parganah of Majnamuta"

"I, Jadavram Roy of the Parganah Majnamuta, in the district of Ingelee (Hijli) aggreeable to an order which has issued from the Nawab to this purpose, that I should attend upon the gentlemen of the committee and council in order to settle my trade in salt and that I should not deal with any other person do accordingly oblige myself, and give this writing, that expect the said gentlemen called.' The English Society of merchants for buying and selling all the salt, Bettle –nut, and Tobacco in the province of Bengal, Bihar and Orissa and etc. I will on no account trade with any other person for he salt to be made in the year 1973, and without their order I will not otherwise make away with or dispose of a single grain of salt, but whatever salt shall be made within the dependencies of my Jamindary, I will faithfully deliver it all without delay, to the said society, and I will received the money according to the agreement which I shall make in writing. I will deliver the entire quantity of the salt produced, and without the leave of the said committee will not carry to any other place, nor sell to any other person a single measure of salt. If such a thing should be proved against me, I will pay to the Sarcar of the said society a penalty of five rupees per every mound." 28

উল্লেখ্য মালঙ্গীর লবনাম্বু উত্তপ্ত করবার জন্য যে সব স্থান থেকে কাঠ সংগ্রহ করা হত সেই সব জমিকে 'জলপাই জঙ্গল' বলতো। এই জন্য জলপাই জঙ্গল কে বিশেষ ভাবে রক্ষা করা হত।
১৭৭২ সাল নাগাদ কমলউদ্দিন হিজলী নিমক মহালের ইজারা নিয়েছিলেন এবং ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত ইজারাদার ছিলেন। তার আগে কাসেম আলি খাঁ (১৭৬৫ — ১৭৬৭), জইন আলাউদ্দিন (১৭৬৭ — ১৭৬৯), দৌলত সিংহ (১৭৬৯ — ১৭৭০) ও লুসিংটন সাহেব (১৭৭০ — ১৭৭১) এবং তাঁর পরে পঞ্চানন দত্ত (১৭৭৭ — ১৭৭৮) ও র াজা যাদব রাম রায় (১৭৭৮ — ১৭৮০) ইজারাদার হয়েছিলেন। ইনিই হিজলীর শেষ লবণ ইজারাদার। কমলউদ্দিন হলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বিশেষতঃ তাঁর মানসিকতা, চরিত্র অতি খারাপ ধরণের ছিল। হিজলীর ইজারাদারী পেয়ে তিনি মলঙ্গীদের উপরে নানাপ্রকার অত্যাচার করতেন। একবার কিছু মালঙ্গী তার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে ১৭৭৪ সালে নভেম্বর মাসে কলকাতা কাউন্সিলে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেছিলেন। ঐ ব্যপারে হেস্টিংসের আশ্রিত খ্যাতনামা কান্ত াবাবুও লিপ্ত থাকায় কমলউদ্দিন সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন।১৩

১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর হিজলী প্রদেশও কোম্পানীর হস্তগত হয় কিন্তু ঐ সময় ঐ প্রদেশের র াজস্ব সংক্রান্ত কাজের কোন বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নি। ঐ সব জায়গা মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের নায়েব দেওয় ানের অধীনস্ত দেশীয় কর্মচারীদের সাহায্যে আগে যেমন চলেছিল সেই রকম চলতে থাকে। এই বন্দোবস্তে কাজের নানা রকম অসুবিধা হতে থাকায় কোম্পানী ১৭৬৯ সাল থেকে প্রত্যেক চাকলায় বা জেলায় সুপারভাইজার নামে এক ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁরা কোম্পানীর মুর্শিদাবাদের রাজস্ব সমিতির অধীনে কাজ করতেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হেস্টিংস এক সময় ওড়িশার উপকূলবর্তী এলাকাগুলি ইজারা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ঐসময়ে মেদিনীপুর জেলার মারাঠা পরগণাগুলির এই জেলার সংলগ্ন ওড়িশার পরগণাগুলি বাল্কেরের মারাঠা ফৌজদারের উপর ন্যস্ত ছিল এবং মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানীর বোঝাপড়ার অভাবে তারাও কার্নল হ ার্কট নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারীকে বাল্কেরের রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। তিনি একই সঙ্গে পোষ্ট মাস্টার এবং মারাঠা লবণ সংগ্রহের জন্য এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮০৩ সালে ওড়িশা সম্পূর্ণভাবে কোম্পানীর অধীনে না আসা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল।

মারাঠা অধিকৃত যে পরগণা গুলিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হত তারই মধ্যে পটাশপুর, ওড়িশার জল্কের থানার দক্ষিণে-পূর্বে কামারদা, সুবর্ণরেখা নদীর মোহনার নিকটবর্তী ভোগরাই এবং নওশারী বিশেষ বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে হিজলীর সল্ট এজেন্সীর অধীন অধিকাংশ লবণ উৎপাদনের খালাড়ী গড়ে উঠেছিল এবং কামারদার চর্তুদিকে গড়ে উঠেছিল। ছোট বড় যে সমস্ত 'খালাড়ী' গড়ে উঠেছিল সেইগুলির মধ্যে পটাশপুর নওশারী এবং ভোগরাই প্রভৃতি পরগণার নানাবিধ প্রসঙ্গে হিজলীর সল্ট এজেন্টদের চিঠি পত্র থেকে পাওয়া যায়। ঐ সময় পটাশপুর প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখছেন, " The Maratha pargunnah of pattaspore about 25 miles to west ward of this o the borders of Midnapore……. Is said to be the medium of much clandestine traffic not only for salt manufacture therein but of salt brought from the neighboring Maratha districts and there deposited …. the merchants who deal in this traffick have, as I an told, small golahs of their own close to Pattaspore here under cover of Rowannahs they maintain and dispose of salt and replenish their Golahs by clandestine importation from the grand depots within the District of Pattaspore.
কোম্পানীর এর সভাপতি কে লেখা অন্য একটি চিঠিতে নওশারী এবং ভোগরাই উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটি হল। " Nausrey is situated on the border of the Maratha country trom which it is divided by a Bundh. It lies in a south – west direction from Contai, distant fourteen coss, from piply it is 4 coss, from Beercool 4 coss, from the sea 2 coss. The salt Golah stands upon the banks of a creek or hallah that leads into piply river. North –east. The Maratha salt to this golah through this nallah, and

when remove from there by water carriage is against put into small boats lying off pipley Bar ready to receive it, and transport it to calcutta…….Nausrey is almost surrounded by salt workers. Those belonging to Marathas in Pergunnah Bograi are within sight at no greater distance than a quarter of a mile.
পটাশপুর এবং ভোগরাই এই দুটি পরগণায় মারাঠা তহশিলদারদের তত্ত্বাবধানে প্রচুর লবণ উৎপাদন হত। সুবর্ণরেখার পূর্বদিকের পরগণাগুলির মধ্যে উৎপাদিত লবণ মারাঠা লবণ নামে পরিচিত ছিল। এই লবণ্যব্যাপারীর উৎপাদক মালঙ্গীদের কাছ থেকে সোজাসুজি কম মূল্যে কিনে নিয়ে জেলার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এবং জেলার বাইরে উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে চালান দিত। মারাঠা লবণ গোপন পথে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ হ্রাস হওয়ার ভয়ে জেলার গুত্বপূর্ণস্থানে চৌকির ব্যবস্থা হয়। কোম্পানী কেশিয়াড়ী, জল্মের, নাপো, সুপার, কুল, হাটনগর, কালকাপুর, শিবপুর, আগ্রাচার, তুকারাই, কৃষ্ণনগর, কাঁথি, ইড়িঞ্চি, চারমুখা, কাঁটানগর, পটাশপুর সীমান্ত, কুলবনি, গোপীবল্লভপুর, জামবনি, বলরামপুর, ঘাটশিলা, বুড়িবাবি, রৌগর, মানভূমি, ছাতনা, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে চৌকি স্থাপন করে প্রতিটি চৌকি একজন দারোগার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করা হয়।

মারাঠা এবং কোম্পানীর মধ্যে ১৯৮৫ সালে এক বন্দোবস্তের বলে বাল্মের মারাঠা ফৌজদারের অধীনে, সমস্ত পরগণাগুলির মধ্যে উৎপন্ন লবণ একমাত্র কোম্পানীকে বিত্রি করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা লবণ কোম্পানীর এলাকায় আমদানী বন্ধ করা। ঐ সময় মারাঠারা হিজলী সল্ট এজেন্টের রসুলপুর গোলায় লবণ সরবরাহ করত। তারা চুক্তি অনুযায়ী কখনও লবণ সরবরাহ করত না। কারণ লবণের গোপন বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে শালকিয়া (হাওড়া) গোলায় ৩০,০০০ মণ ওড়িশার লবণ ১১৯ টাকা মূল্যে (প্রতি শত মণে) মারাঠাদের সরবরাহ করতে বলা হচ্ছিল। হিজলী সল্ট এজেন্ট ঐ লবণ ৫৫ টাকা মূল্যে নওশারীর গোলায় ত্রয় করার প্রস্তাব করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। যাই হোক নানা প্রকার ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাল্মের এবং মেদিনীপুর জেলার সংলগ্ন মারাঠা পরগণাগুলি থেকে গোপন পথে কোম্পানীর এলাকার মধ্যে লবণের চোরা চালান পূর্বের মতই ছিল।

মারাঠাদের লুঠতরাজ এবং গোপন লবণের চোরা চালান একই ভাবে চলছিল। ১৭৯১ সালের হিজলীর সল্ট এজেন্ট এই সব ঘটনার জন্য শাস্তি বিধানের প্রস্তাব করেন। প্রসঙ্গতঃ মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম সীমান্ত বরাবর পথ ধরে যে কোন সময় ওড়িশার মারাঠা পরগণাজাত লবণ সুবর্ণরেখা পারকরে কোম্পানীর এলাকার মধ্যে মজুত করা হত। কোম্পানী সতর্ক হওয়ার ফলে লবণ পাচার যথাত্রমে কমে যায়। পরবর্তী কালে বাল্মের এবং তার নিকটবর্তী মারাঠা পরগণাগুলি থেকে উৎপন্ন লবণ নদী পথে সুবর্ণরেখা হয়ে সড়ক পথে জল্মের এবং নয়াবসান প্রভৃতি চৌকিগুলি এড়িয়ে উলেমারা যেত। এই একই পথে ভোগরাই এবং পিপলির লবণ চলাচল করত, এই ধরণের নানাবিধ সংবাদ পাওয়া যায়।
লর্ড ওয়েলেশলি ভারতের গভর্নর জেনারেল হওয়ার পরে ১৮০৩ সালে মারাঠাদের অধীন সকল পরগণাগুলি একযোগে আত্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঐ সময় কর্নেল হার্কট কটকের এবং কর্নেল ফার্গুশন জল্মের, বাল্মেরের সৈন্য দলের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ফার্গুশন সেপ্টেম্বর মাসে (১৮০৩) বিনা ক্ষয় ক্ষতিতে বাল্মের অধিকার করেন এবং একই সময়ে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল পটাশপুর অধিকার করেন। ১৮০৩ সালে দেঁওগাঁও-এর সন্ধি অধিকৃত পটাশপুর, ভোগরাই কামারদাচর পরগণা গুলিসহ সমগ্র ওড়িশার অধিকার কোম্পানীকে অর্পণ করেন। এরপর সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর দিকে সবকটি মারাঠা পরগণা হিজলী সল্ট এজেন্টের অধীনে অর্ন্তভুক্ত হয়। জঙ্গল মহালগুলিও মারাঠাদের অত্যাচার মুক্ত হয় যার ফলে অচিরেই সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় কোম্পানীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বের তুলনায় কোম্পানীর সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিজলীর সল্ট এজেন্ট চ্যাপমান একটি চিঠিতে ঐ সময় ৬১৪১৩ মণ মারাঠা লবণ ত্রয় করা ছাড়াও ঐ ত্রয়ের পরিমাণ পরের বৎসর ৭০০০০ মণে দাঁড়াবে এই আশা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কোম্পানী ১৯৭৩ সালের ২৭শে অক্টোবর একটি ঘোষণা জারি করে যে লবণ চোরা চালান বন্ধ করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে ব্যক্তি কোম্পানীর এলাকার মধ্যে মারাঠা লবণ আমদানী সংবাদ জানাবে কিংবা যে কর্মচারী ঐ ধরণের লবণ ব

াজেয়াপ্ত করবে তাদের অর্থ মূল্যে পুরস্কার দেওয়া হবে। চৌকির কর্মচারীদের তৎপরতায় মারাঠা লবণের চোরা কারবার প্রকৃত পক্ষে পরিত্যক্ত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে কোম্পানীর আমলে চোরাকারবার মেদিনীপুর মারাঠা হাঙ্গামা ও লবণ কারবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ ছিল।

যাইহোক আবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। ১৮০১ সালের ৬ নং রেগুলেশন অনুসারে বলা হল, বেআইনি খালাড়ি জমিতে লবণ উৎপাদকদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। সেই বছর হিজলীর সল্ট এজেন্ট ফারকুহারসন হিসেব করেন, গোপনে অন্তত চল্লিশ হাজার মণ লবনের উৎপাদন হয়েছে এবং কোম্পানীর শুল্ক সেই হারে বাকি পড়েছে। ১৭৮০ সালের পরবর্তী বছর গুলিতে ইৎমামদার বা ঠিকাদার শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এদের অবস্থা ত্রমশ খারাপ হয়ে পড়ে। হিজলীর এজেন্ট চ্যাপম্যান কিন্তু ইৎমামদার শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু ১৮০২ সালে ফারকুহারসন তাদের সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ করে দেন।

১৮১৮ সালের রেভিনিউ অফিসার এওয়ার-এর মতে, মণ প্রতি আড়াই কাহন ছিল ওড়িশা লবণের দাম। ওড়িশা লবণ প্রচুর পরিমাণে আমদানী হলে নিকি মহলে প্রস্তুত লবণের চাহিদা এবং সেইসঙ্গে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ কমে যাবে। সেই ভয়ে অভ্যন্তরীণ স্থল ও জলবাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হল। ভ্যানসিটার্টি চেয়েছিলেন, কোম্পানীই কেবল সমস্ত ওড়িশার সমস্ত লবণ কেনবার অধিকারী হবেন। কিন্তু কটকের ফৌদার চান অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি।

ওড়িশার সঙ্গে গোপন বাণিজ্য ছাড়াও অভ্যন্তরীণ স্থল বাণিজ্যের ব্যবসাও চলছিল। অনেক সময় ওলন্দাজরা গোপনে লবণ নিয়ে সরে পড়ত। ভারতের ইতিহাসে চরিত্রহীনতা ও দুর্নীতির বীজ অনেকদিন থেকে সঞ্চিত রয়েছে। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ মন্তব্য করেছেন - এই দুর্নীতি চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোয় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। কর্ণওয়ালিশ অবশ্য ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা করেন। এই দুর্নীতি ও অত্যাচারের ফল আমরা চুয়াড়, পাইক ও জঙ্গল জমিদারদের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে দেখেছি। এটা বলা যেতে পারে বাঙলার দক্ষিণ-পশ্চিমের কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের সামাজিক অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ।

কোম্পানীর আমলে যে বোর্ড অব্ ট্রেড লবণ দপ্তর এবং এজেন্সীগুলি লবণের মাধ্যমে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় এবং লবণের বাজার সম্প্রসারণে যত্নবান ছিল। হোল্টম্যাকেঞ্জি ১৮৩২ সালে কমনস কমিটির কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ঃ " Salt monopoly was being carried out an eye to revenue and not trade" উৎপাদন যন্ত্রের সামগ্রিক পরিদর্শন, লবণ কর সংগ্রহ ও বর্ষার আগে গুদামে সংরক্ষিত অতিরিক্ত লবণের বিত্রি ব্যবসা এজেন্টদের কর্মতালিকার অর্ন্তভুক্ত ছিল। হিজলী ও তমলুকের ২ জন লবণ এজেন্ট সহকারী এজেন্টদের সাহায্য পেতেন। লবণ মলঙ্গীদের কাজ না থাকায় তারা যাতে নিৎসাহ না হয় সেই উদ্দেশ্যে তাদের কিছু চাষের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্ত নগণ্য।

ইতিমধ্যে ১৮৩০ সালে লবণের বাজারে অবনতি হতে থাকে ধীরে ধীরে, চোরাচালান এজন্য কিছুটা দায়ী হলেও শুল্ক, লবণ ও আফিম সংক্রান্ত বোর্ড ১৮৩৪ সালে এই অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেন যে, হিজলী ও তমলুক এজেন্সীর অধীনস্থ অঞ্চলে লবণের ব্যবসায়ী দের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় পরিমানে লবণ সরবরাহের ব্যর্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ১৮৩৫ সালের নবম রেগুলেশন অনুযায়ী বাংলা ও ওড়িশার লবণ চৌকিগুলির জন্য সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত করা হয় চোরা চালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া প্রতি এজেন্সিতে কিছু লবণ বিভাগ আড়ত ও গোলার সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে তমলুক এজেন্সীর অধীনস্থ আড়ত এর সংখ্যা সাত থেকে চারে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং গোলার সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয় ছয় থেকে তিনে।

পূর্বে উল্লেখিত যে তমলুক অঞ্চলে নিমক মহলে মুসলমান আমল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল লবণ উৎপাদন, ১৭৮০ সালে মিঃ আর্কডেকিনের তত্ত্বাবধানে লবণ প্রস্তুতের কাজ আবার নতুন উদ্যমে আরম্ভ হয়েছিল। এই সল্ট এজেন্টের নিমক মহল ছাড়া অন্য কোন কাজে কোন কর্তৃত্ব ছিল না। সেই সময় তমলুকে লবণ উৎপাদনের প্রধান অফিস স্থাপিত হয়েছিল। এই অফিসের কাজ ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় বহু উচচপদস্থ বৃটিশ কর্মচারী ও দেশীয় শিক্ষিত কর্মচারীগণ এখানে আসেন। তখন লবণ ছিল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কৃষক ও সাধারণ মানুষ এই লবণ থেকে প্রচুর অর্থ পেত। তমলুকের তৎকালীন রাজগণ এই ব্যবসায় প্রচুরঅর্থ উপার্জন করতেন। কমলনারায়ন রায় যখন তমলুকের রাজা তখন থেকেই ইংরেজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও ওড়িশার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই ব্যবসা বিশেষভাবে সমরক্ষণের জন্য হিজলী, মহিষাদল ও তমলুক অঞ্চলের জমিদার ও রাজাগণের কাছ থেকে সমস্ত লবণ উৎপাদন ভূমি বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন। মেদিনীপুর জেলার তমলুক এজেন্সীর সল্ট এজেন্ট হেনরী. সি. হ্যামিলটন সাহেব ১৮৫২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর এই লবণোৎপাদন সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা উল্লেখযোগ্য, " From the early records it appears that when the privilege of manufacturing salt was taken out of the hands of the /Jamindars of the district and monopolized by government, the government received from zammdars of paraganas Mysadal and I am look large thacts of jungle and waste lands for their manufacturing purpose allowing them in lieu remissions in the rent of their permanent settlement and also a monthly allowance usually termed "Mooshyera" the former as a consideration for the land actually appropriated by government and the letter as compensation for the withdrawal of the withdrawal of the manufacture of salt from within their respective /Jamindaries."
তমলুক, মহিষাদল, জলামুঠা, আরঙ্গনগর ও গুমগড় এই কটি পরগনায় সল্ট এজেন্টের অধীনে ৬ জন দারোগা, ৪জন মুহুরী এবং ৩২জন চাপরাসী ও ৭৪ জন চৌকিদার নিযুক্ত ছিল, যাতে লবণ উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় ও কোনরূপ নষ্ট না হয়, সেদিকে সরকারের নজর ছিল ছRevenue Board Circular No. 877 dated 20th september 1851গ্ন
তমলুক রাজগণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে লবণ উৎপাদন করতেন। কিন্তু নতুন ব্যবস্থানুযায়ী কোম্পানী লবণ ব্যবসার ক্ষতি পূরণ ও জলপাইভূমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তমলুকের তদানীন্তন রাজা আনন্দনারায়নকে বংশধর পরম্পরায় মাসোহারা দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন। এই মাসোহারা রাজাগণ বংশানুক্রমে চিরকাল পাবেন এই কথাই হয়েছিল। কিন্তু কার্যত তমলুক রাজাগণ তা পাচ্ছে না দেখা গেল। ১৮৩৬ সালের ২২৯ নং চিঠিতে বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী আর. ডি. মন্‌গলস্ সাহেব, রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান সেক্রেটারী জি. আর. কলভিন. সাহেবকে লেখেন, ''এই মাসোহারা টাকা আপাতত বন্ধ করে তা ১২৪১ ও ১২৪২ সালের রাজাগণের দেয় রাজস্বের বকেয়া বা বাকী আদায়ের জন্য কেটে নেওয়া হোক।'' কাজেও তাই করা হতে লাগলো। যদিও পরবর্তী সময় এই ব্যবস্থা নিয়ে মামলা হয় ও রাজা তার মাসোহারা পাবে ঠিক হয়।

১৮৬৩ সালে ১লা মে কোম্পানী বাহাদুর তমলুক-হিজলী অঞ্চলের লবণ উৎপাদন বন্ধ করেন। ঐ সালের ১৬মে তারিখের ১৩৫ নং চিঠিতে কলকাতা বোর্ড অফিসের বড় সাহেব তমলুক ও হিজলীর সল্ট এজেন্টেকে অবগত করেন যে, জলপাই জমি যেন তাঁরা জেলার কালেক্টর সাহেবের দখল দেন। পরে তা কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত হয়।

১৮৫২ সালের আগে কোন সময় রবার্ট চার্লস হ্যামিল্টন এসেছিলেন তমলুকের ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সল্ট এজেন্ট হিসেবে। বর্তমানে বর্গভীমা মন্দিরের সামনে শোনা যায় দেবপ্রসাদ ভৌমিকের বাড়ী যেখানে সেখানেই নাকি ছিল চার্লস হ্যামিল্টনের নুনের গুদাম ও বাসস্থান। তবে মানুষ হিসাবে তিনি দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন। ''হ্যামিল্টন স্কুলে''র তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি এখানে স্থাপন করে ছিলেন। যদিও তমলুক ছাড়ার আগে হ্যামিল্টন সাহেব তমলুক অধিবাসীদের নামমাত্র কিছু মূল্য দিয়ে কোম্পানীকে, কুঠিবাড়ী ও সংলগ্ন জায়গা কিনে নিতেবলেছিলেন। তাই একসময়ে কুঠিবাড়ীতেই স্কুল চলছিল। এখানকার লবণ অফিস শেষ সল্ট এজেন্ট মিঃ করলিফের সময় ১৮৬২ সালে উঠে গিয়েছিল এবং গোলাতে যে লবণ মজুত ছিল তা ১৮৬৬ সালে এককালীন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোম্পানীর একচেটিয়া লবণ ব্যবসার পতন শু হয়। ১৮৬২-৬৩ সালে বিডন্ সাহেব যখন বাংলার ছোটলাট সেই সময় লবণের একচেটিয়া ব্যবসা পরিত্যাগ করে। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ও বেশিমাত্রায় সস্তা দামে লিভারপুলের লবণ এদেশে আমদানি হতে থাকায় সরকারের লবণ কারবারের ত্রমশ ক্ষতি হতে থাকে। এজন্যই সরকার লবণ কারবার উঠিয়ে দেন। সরকার লবণের একচেটিয়া কারবার ছেড়ে দিলে দেশীয় লোকেরা সরকারকে লবণ কর প্রদান করে কিছুদিন এই কারবার চালিয়েছিলেন। কিন্তু আমদানীকৃত বিলেতী লবণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে ন া পেরে অগত্যা এ ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু এদেশে থেকে লবণ কারবার বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার ম ানুষদের চরম দুর্দশায় পড়তে হয়।

এই পরিস্থিতিতে আর্থিক দিক দিয়েও উৎপাদকের ক্ষেত্র আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। গ্রামাঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ম্য ালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ, বদ্ধ জলাশয় ও পচা খানাডোবার দূষিত আবহাওয়া ছেড়ে তাই শ্রমিকেরা ১৮৫০ সাল থেকে কলকাতা এবং কাছাকাছি শহরাঞ্চলের দিকে চলে যেতে শু করল উপযুক্ত কাজের সন্ধানে। মেদিনীপুরের ব্য াপক লবণ শিল্প অবশেষে পরিণত হল 'সীমিত গৃহশিল্পে'। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর ডাকে মেদিনীপুরের কাঁ থি, তমলুকের সম্পন্ন চাষীদের নেতৃত্বে 'লবণ আন্দোলন' লবণ উৎপাদন পুনর্জ্জীবিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com